



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 683 - 692

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

কবি আল মাহমুদের কবিতা ও আধুনিকতা

মোহাম্মদ আবদুল কাদের

প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা

জৈতুন নাহার কাদের মহিলা কলেজ, নোয়াখালী, বাংলাদেশ

ও

গবেষক

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

Email ID: hkfeni@gmail.com

 0009-0001-3850-9721

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Al Mahmud,
Modern
Bengali poetry,
Sonali Kabin,
Kafela,
Mayabi Porda
Dule Otho,
Modernism.

Abstract

Al Mahmud is one of the most vibrant and significant poets of Bangladesh. He occupies an important place in the tradition of modern Bengali poetry. While his poems are deeply infused with the earthy fragrance of rural Bengal, they simultaneously reflect modern sensibilities, politics, human anguish, and lived reality. Although his poetic journey began within an influenced and inherited framework, he soon developed an independent vision in opposition to colonial modes of thought and literary practice. As a result, through new ideas and a fresh poetic language, he played a bold role in creating vitality and diversity in Bangladeshi literature. Al Mahmud is not merely a romantic poet; he is a powerful voice animated by the consciousness of his time. His language is fluent, his imagery vivid, and his metaphors and symbols have added new dimensions to Bengali poetic expression. Through familiar scenes of rural life, he reveals the complexities and conflicts of urban existence. In poetry collections such as 'Sonali Kabin', 'Kafela', and 'Mayabi Porda Dule Otho', the depth and beauty of modern poetry find profound expression. This essay analyzes various manifestations of modernism in Al Mahmud's poetry, including individual freedom, social tensions, religious sensibility, love and desire, and questions of existence. It demonstrates how Al Mahmud's poetry has created a new current in Bengali literature, where tradition and modernity merge to form a unique poetic world. Therefore, it can be said that Al Mahmud's poetry stands as a meaningful and accomplished expression of modernism.

Discussion

গবেষণার উদ্দেশ্য : ‘আধুনিকতা ও আল মাহমুদের কবিতা’ শীর্ষক প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল—

১. আধুনিকতার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা : আধুনিকতা কী, তা সাহিত্যিক মনোভাব ব্যাখ্যা করা এবং বাংলা কবিতায় এর প্রভাব অনুধাবন করা।
২. আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার ধরন অন্বেষণ করা : তাঁর কবিতায় সময়-সচেতনতা, ব্যক্তি-মনস্তত্ত্ব, সমাজ ও ধর্মীয় প্রশ্ন, প্রেম ও মানবিক টানাপোড়েন এ সব আধুনিক উপাদান কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ করা।
৩. আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদের ভূমিকা নির্ধারণ : আল মাহমুদের কবিতা কীভাবে আধুনিক কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছে, তার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা।
৪. আল মাহমুদের ভাষা ও চিত্রকল্পে আধুনিকতার বহিঃপ্রকাশ বিশ্লেষণ : কবির ভাষাশৈলী, প্রতীক, উপমা ও রূপকের মাধ্যমে আধুনিক জীবনচেতনার প্রতিফলন তুলে ধরা।
৫. ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণে তাঁর কাব্যজগতের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা : আল মাহমুদ কীভাবে ইসলামী ভাবনা, ইতিহাস ও মাটির গন্ধ নিয়ে আধুনিক কবিতা নির্মাণ করেছেন, তা ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার লক্ষ্য :

১. বাংলা আধুনিক কবিতার ধারায় আল মাহমুদের অবস্থান নির্ধারণ করা।
২. আধুনিকতা বলতে কী বোঝায় এবং তার সাহিত্যিক রূপ কী তা বিশ্লেষণ করা।
৩. আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার প্রকাশ ও উপাদান চিহ্নিত করা।
৪. তাঁর কাব্যভাষা, চিত্রকল্প, ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে আধুনিকতা কীভাবে ফুটে উঠেছে তা অনুধাবন করা।
৫. ঐতিহ্য, ধর্ম ও সমাজবোধের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার ক্ষেত্র :

১. আল মাহমুদের প্রধান কাব্যগ্রন্থসমূহ, যেমন - সোনালি কাবিন, কাফেলা, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, বখতিয়ারের ঘোড়া ইত্যাদি।
২. বাংলা আধুনিক কবিতার ধারা এবং ত্রিশোত্তর কবিদের কাব্যচিন্তা।
৩. গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব এবং আত্মজিজ্ঞাসা বিষয়ক কবিতা।
৪. কবির নিজস্ব জীবনদর্শন ও বিশ্বাস, যা আধুনিকতা গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

গবেষণার পদ্ধতি :

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ বিশ্লেষণ : আল মাহমুদের নির্বাচিত কবিতাগুলোতে আধুনিকতার বিষয়বস্তু ও উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. বলা ও লিখিত তথ্যসূত্র : তাঁর কবিতা ছাড়াও সমকালীন সাহিত্যিকদের মতামত, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ও সমালোচনা গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩. তুলনামূলক বিশ্লেষণ : অন্যান্য আধুনিক কবিদের (যেমন শামসুর রাহমান, আবুল হাসান প্রমুখ) কবিতার সঙ্গে তুলনা করে আল মাহমুদের ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
৪. ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি : কবিতার চিত্রকল্প, রূপক, ভাষা ও ভাবনার গভীরে গিয়ে তাৎপর্য বের করা হয়েছে।

ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিশিষ্ট পথিকৃৎ হলেন কবি আল মাহমুদ। গ্রামীণ জীবনের সহজ-সরল রূপ, ইতিহাস-সংস্কৃতি, প্রেম-প্রকৃতি, ধর্মীয় অনুভব এবং নাগরিক জটিলতার এক অনন্য মিশ্রণ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। তিনি বাংলা কবিতায় এমন এক আধুনিকতাবোধের সূচনা করেছেন, যা পশ্চিমা অনুকরণ নয়, বরং আমাদের মাটির গন্ধমাখা

জীবনচেতনা থেকে উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়, কীভাবে আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই আধুনিকতা বাংলা কাব্যধারায় কী পরিবর্তন এনেছে। বিশেষভাবে আধুনিক কবিতার ইমারতে লৌকিক উপাদানের শৈল্পিক কারুকাজ কবিকে আত্মআবিষ্কার, ঐতিহ্য-অন্বেষণ ও বি-উপনিবেশায়নের পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। সেই সাথে দীর্ঘ কাব্যযাত্রায় কবি বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন অনন্য উচ্চতায়।

আধুনিকতা : ধারণা ও প্রাসঙ্গিকতা : ‘আধুনিক’ শব্দটি সময়ের দিক থেকে ক্রম-অগ্রসরমান, ক্রমপরিবর্তমান ও সঞ্চরণশীল। রবীন্দ্রনাথের মতে, এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেলে। সাহিত্য তেমনি বারবার সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।^১ এই মর্জির সাথে তিনি শাস্ত্রতত্ত্বের কথা বলেন—

“আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটাই শাস্ত্রতত্ত্বের আধুনিক।”^২

আধুনিক কবি ও কবিতা বলতে অধিকাংশ লেখক রবীন্দ্রোত্তর তথা তিরিশোত্তর কবি ও কবিতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যাকে সমকালে ‘অতি আধুনিক’ বা ‘অত্যাধুনিক’ বাংলা কবিতা বলা হত। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকতার দুটি অর্থই বর্তমান; এক অর্থে সে সাম্প্রতিক, সমকালীন ও সমসাময়িক; অন্য অর্থে চিরকালীন, শাস্ত্রতত্ত্ব, ভাস্কর্য। এই অর্থময় আধুনিক বাংলা কবিতার স্রষ্টারা হলেন— জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩- ৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯) প্রমুখ।

‘আধুনিকতা’ বলতে আমরা বুঝি এমন এক চিন্তাধারা, যেখানে ব্যক্তি-সচেতনতা, আত্মজিজ্ঞাসা, বাস্তবতা, মানবিক সংকট ও সময়চেতনার উপস্থিতি থাকে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কবিরা এই আধুনিকতার পথ বেয়ে কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁরা সমাজের রূপান্তর, অস্তিত্বের সংকট ও শহর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কবিতায় তুলে ধরেন। আল মাহমুদ এই ধারার ধারক-বাহক হলেও তাঁর কাব্যে আধুনিকতা এসেছে গ্রাম, ধর্ম, ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের গভীর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে।

বাংলা অঞ্চল দীর্ঘ দিন ঔপনিবেশিক কাঠামোর অধীন থাকার কারণে ‘আধুনিকতাবাদী’ সাহিত্য বিস্তার লাভ করে। ইতিহাসের পটভূমি ও কাব্যপ্রকৃতি বিচারে ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’কে আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-৮২) কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী রূপে গণ্য করেছেন।^৩ এই মতটিকে আমরা এই আলোচনায় গ্রহণ করেছি। যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-৭৩) রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ বলেছেন।^৪ অন্যদিকে ক্লসয়দ আলী আহসানের মতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছেন।^৫

সাহিত্যিক অর্থে আধুনিকতা মানে হল ব্যক্তিচেতনার উন্মেষ, বাস্তবতা ও জটিলতা অনুধাবন, আত্মজিজ্ঞাসা, মূল্যবোধের টানাপোড়েন এবং সমাজ-রাজনীতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা কবিতায় এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আল মাহমুদ আধুনিকতার যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা কেবল পশ্চিমা প্রভাব নয়; বরং এ এক আধুনিকতা, যেখানে বাংলার মাটি, মানুষ, ভাষা, ধর্ম ও ইতিহাস সবকিছু মিলেমিশে নতুন রূপ পেয়েছে। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার যাত্রা শুরু রবীন্দ্র-বিরোধিতা এবং যুগ সচেতনতার মধ্য দিয়ে। বিশ-শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যে সব কবি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে স্বাধীনভাবে কবিতা রচনার মাধ্যমে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলামের স্থান শীর্ষে। আর রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।^৬ পৌরুষ ও শক্তির চিত্তচাক্ষুণ্য, গণচেতনা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়, স্বজাত্যবোধ ও স্বাধীনতার স্পৃহায়, মানবতা ও সাম্যবাদের বাণীবিন্যাসে তাঁর কবিতা সমুজ্জ্বল। রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা, -

“বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!

অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

[আমার কৈফিয়ত', সর্বহারা]

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি কবিতায় ইশতেহার রচনা করলেন—

“পাশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীর তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য স্নান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।”^৭

তিরিশোভর আধুনিক কবিদের পথ অনেক দূরবর্তী বন্দরের দিকে এবং আপন চক্ষের’ আলেয় তারা সেইখানে পৌছাতে চান। আর পৌছাতে চান বলেই দ্রোহী মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায় বিষুদের কণ্ঠে। বরীন্দ্রব্যবসা ছেড়ে আধুনিকরা সমুদ্রের দিকে’ যাত্রা করেন নতুন দিগন্তের প্রত্যাশায়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ –

“বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য প্রচুর - কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুষ্টর। ...এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়।”^৮

অর্থাৎ রবীন্দ্রের হওয়ার সংগ্রামে এইসব আধুনিক কবি রবীন্দ্র-ব্যতিক্রমী মন ও মর্জি, ভাষা ও ভঙ্গির অবলম্বন করেন। এর প্রমাণ তাঁদের প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে: জীবনানন্দ দাশের ‘ঝরা পালক’ (১৯২৭) ও ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘তন্ত্রী’ (১৯৩০); বিষু দে-র ‘উর্বশী’ ও ‘আর্টেমিস’ (১৯৩৩); বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা ও ‘অন্যান্য কবিতা’ (১৯৩০); প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম (১৯৩০) ইত্যাদি।

আধুনিকতাবাদী কবি না হয়েও আল মাহমুদ আধুনিক মেজাজ ও প্রকরণে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতিকে অন্তর্লীন করে নিয়েছেন। স্বদেশের রূপ ও চেতনার উপকরণ, দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রভাব ও প্রতিফলন, ধর্ম-সমাজ ও বস্তুগত জীবনের অত্যাশঙ্ক খুঁটিনাটি এবং সর্বোপরি মৌলিক গ্রামীণ বাংলার ভেতরদেশ থেকে আল মাহমুদ কবিতা সৃজন করেন।

দেশজ জনজীবন, কিশাণ-কিশাণী ও প্রকৃতির মাঝেই তাঁর জীবনবেদ ও নিষ্ঠাবান কাব্যবিশ্বাস উপস্থাপন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, গ্রামের কথকতার অর্থ গ্রাম্যতা নয়; সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশকে ভালোবাসা একজন কবির জন্যে অপরিহার্য শর্ত। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সাথে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন যে গ্রামীণ জীবনকাঠামো ও জীবন-সংস্কৃতি, নাগরিক জীবনযাপনের জটিল ও কঠিন অভিজ্ঞতার মাঝে বসে আল মাহমুদ তাকেই লালন করেছেন চেতনার উজ্জ্বলতায়। নদীময় গ্রামীণ সভ্যতার নায়ক যে কিশাণ-কিশাণী এবং কৃষিক্ষেত্র যে প্রকৃতি তাকেই কবি কবিতার কেন্দ্রে স্থাপন করেন।

“আমার বিষয় তাই, যা গরিব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি, ফলবান মাটি আর
কালচে সবুজে ভরা খানখন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।
চাষীর বিষয় নারী
উঠানে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী।”

[কবির বিষয়’, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না]

আল মাহমুদের কবিতা একদিকে যেমন কৃষিনির্ভর বাংলার স্বাদ এনে দেয়, তেমনি অন্যদিকে মানব জীবনের জটিল আবেগ, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং দর্শনচিন্তাও তুলে ধরে। তিনি আধুনিক জীবনযাত্রার সংকট, প্রেম-যৌনতা, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও অস্তিত্বের প্রশ্নকে নিজের কবিতায় জায়গা দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘সোনালি কাবিন’ আধুনিক বাংলা কবিতার এক যুগান্তকারী সংযোজন। এখানে প্রেম, কামনা, বিয়ে, যৌনতা ও সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব একসঙ্গে উঠে এসেছে।

“তোমাকে পেলাম না বলেই বুঝি
সমস্ত পেয়েছি, হৃদয়পুরে এখন
তুমিহীন বৃষ্টি নামে।”

এই ধরনের কবিতার ভাষা, চিত্রকল্প ও বিষয়বস্তু আধুনিক, কিন্তু উপস্থাপনা খুবই সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী।

আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার রূপ : আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে এক ভিন্ন স্বর ও ভাষায়। তাঁর ‘সোনালি কাবিন’ কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখি প্রেম, শরীরী আকর্ষণ, বিয়ের সামাজিক বাঁধন ও নারীর স্বাধীনতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, যা তখনকার সময়ে সাহসী ও ব্যতিক্রমী। তিনি প্রেমকে শুধু রোমান্টিক আবেগের জায়গায় রাখেননি, বরং একজন পুরুষের আত্মপরিচয়ের সংকট এবং নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সবমিলিয়ে কবিতাকে করেছেন জীবন ঘনিষ্ঠ।

“তোমার শরীর ছুঁয়ে আমি পৃথিবীর প্রেমে পড়ি,
ভাঙি রোজকার ধর্মের ধূলি...।”
(সোনালি কাবিন)

এই ধরনের কবিতায় প্রেম, শরীর, ধর্ম ও সমাজ একসঙ্গে উঠে এসেছে, যা আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

“আমার আত্মা কি ঈশ্বরের পাশে বসে
নিজের শরীরের বিরুদ্ধে কথা বলে?”
(মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, আল মাহমুদ)

আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপকল্প নির্মাণ; ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিকের উপস্থিতি এবং প্রকৃতি-নারী-স্বদেশের চিত্রকল্প সৃজনে আল মাহমুদের কবিতার কারুকাজ বারবার মনে করিয়ে দেয় সুলতানের চিত্রকর্মের মতোই পশ্চিমের আধুনিকতার বদলে আধুনিক শিল্পকর্মের কথা।

কবির এই অবস্থান কাব্যযাত্রার সূচনাকাল থেকে একুশ শতকে এসে আরও বিস্তৃত হয়। বিশেষভাবে সোনালি কাবিনে কবি হয়ে ওঠেন বহুমাত্রিক ও শিল্পশিখরস্পর্শী। কাব্যযাত্রায় লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস, (১৯৬৬) ও সোনালি কাবিন (১৯৭৩) কাব্যত্রয়ী প্রকাশে প্রথম পর্ব সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার পর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে কবি জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। বাঁকবদল ঘটে মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬) কাব্যে ভাব/বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই। কবি একের পর এক সৃষ্টি করেন অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৫), আরব্যরজনীর রাজহাঁস (১৯৮৭), প্রহরান্তের পাশফেরা (১৯৮৮), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), মিথ্যাবাদী রাখাল (১৯৯৩), আমি, দূরগামী (১৯৯৪), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৬) নামের কাব্যগ্রন্থ। ‘বারুদ ও গন্ধকের নদী’ সাঁতার দিয়ে একুশ শতকে এসে কবি অর্জন করেছেন একজন মৌলিক, স্বতন্ত্র ও শক্তিমান কবির পরিচয়। রচনা করেন দ্বিতীয় ভাঙন (২০০০) নদীর ভিতরে নদী (২০০১), উড়ালকাব্য (২০০৩) না কোন শূন্যতা মানি না (২০০৪), বিরামপুরের যাত্রী (২০০৫), তোমার জন্য দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (২০০৫), রুদগন্ধী মানুষের দেশ (২০০৬) কাব্যগ্রন্থগুলো। পরবর্তীকালে আলাদাভাবে নগরীর কথা নয় চাষবাসের গল্প (২০০৭), তুমি তৃষ্ণা তুমিই পিপাসার জল (২০০৭), সেলাই করা মুখ (২০০৮), তোমার রক্তে তোমার গন্ধে (২০১০), পাখির কথায় পাখা মেললাম (২০১২), আমি সীমাহীন যেন-বা প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো (২০১৩) কাব্যগ্রন্থসমূহ প্রকাশ পায়। জীবনের শেষ পর্যায়ে প্রকাশিত হয় মহাকাব্য এ গল্পের শেষ নেই শুরুও ছিল না (২০২০)। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত আল মাহমুদের ছাব্বিশটি কাব্যগ্রন্থ, কবিজীবন ও কাব্যচারিত্রের বাঁকবদল নানাভাবে বিন্যস্ত।

আল মাহমুদের কবিতায় কবিপুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একেবারে সরল বা দ্বিধামুক্ত নয়। গাঁয়ের ছেলে যখন অনিবার্য প্রতিকূলতা জয় করে নিজ গ্রামে ফিরে আসে, তখন শস্যের শিল্পীরা অবাক হয়ে যায়। সে যে গাঁয়েরই সন্তান, সকলের লোক, তাঁর স্বজনের মেলে দেয়া বিচালিতে বসতে লজ্জা থাকার কথা নয়। কিন্তু গাঁয়ের লোকের আন্তরিক আহ্বানে প্রত্যাগত পুরুষের বাধা আসে কৃত্রিম-নাগরিক পোষাকের কারণে। কবি যে জনপদকে নির্মাণ করেছেন আধুনিক মানচিত্রের

অন্তরালবর্তী অনুপ্রেরণায়, সেখানে পৌঁছার জন্য একটা বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্তরঙ্গভাবে। আপন কাব্যরীতির উৎস, প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই জীবনাচরণ ও তার অন্তর্গত বিষয়গুলোকে ধারণ করতে চেয়েছেন নিবিড় ভাবে।^{১৮} এই জন্যেই কবি সকল অসহায়তা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করে স্থানিক জগৎ থেকে বাংলাদেশের বিশাল আড়িনায় ফিরে আসে আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনায়।

“তোমাকে বসতে হবে এখানেই

এই ঠান্ডা ধানের বাতাসে।

আদরে এগিয়ে দেওয়া হুকোটাতে সুখটান মেরে

তাদের জানাতে হবে কুহিলি পাখির পিছু পিছু

কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরোজ!”^{১৯}

[খড়ের গম্বুজ’, সোনালী কাবিন]

ভাষার নবীনতা ও চিত্রকল্প : আল মাহমুদের কাব্যভাষা আধুনিক হলেও সে ভাষা গড়ে উঠেছে বাংলা গাঁয়ের জীবন, কৃষি, নদী, পাখি, ধানখেত, গন্ধ ও ছন্দ থেকে। তাঁর কবিতায় এমন অনেক শব্দ ও চিত্রকল্প আছে, যা অন্য কোনো আধুনিক কবির মধ্যে এত স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় না। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে একদিকে অনুভব নির্ভর, অন্যদিকে দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ।

আল মাহমুদের কবিতার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষা ও চিত্রকল্প। তিনি বাংলা কবিতাকে এক নতুন কাব্যভাষা উপহার দেন। তাঁর কবিতায় মাটি, জল, বৃক্ষ, নারী, নদী সবকিছুই এক বিশেষ দ্যোতনায় জেগে ওঠে। এ এক নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, যা আধুনিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখে।

আল মাহমুদের কবিতার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষা ও চিত্রকল্প। তিনি বাংলা কবিতাকে এক নতুন কাব্যভাষা উপহার দেন। তাঁর কবিতায় মাটি, জল, বৃক্ষ, নারী, নদী সবকিছুই এক বিশেষ দ্যোতনায় জেগে ওঠে। এ এক নিজস্ব ভাষাভঙ্গি, যা আধুনিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখে।

গ্রামীণ জীবনের চিত্রকল্প : গ্রামের মাঠ, নদী, তালগাছ, পাখি, কৃষক - এসব নিয়ে তিনি যে চিত্র একেছেন, তা খুবই জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী।

“চরের মধ্যে ধানখেতের ঘ্রাণ এসে পড়ে হাওয়ায়

সেই ঘ্রাণে জেগে ওঠে প্রেম।”^{২০}

এই ধরনের চিত্রকল্প পাঠকের সামনে একটি সরল অথচ আবেগময় দৃশ্য হাজির করে।

নদী, নদীতীরবর্তী জনপদ ও গ্রাম তাই তাঁর কবিতায় বিস্তৃত, প্রাণবন্ত ও মৌলিকতায় অনন্য। অনুকরণ ও কৃত্রিমতা একদম কাজ করেনি সেখানে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কপোতাক্ষ নদ কবিতায় শৈশবের নদীর দেশে, আবহমান বাঙালি অনুষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হবার বাসনায় আকুল হয়ে নিজেকে স্মরণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। আল মাহমুদের যাত্রা তৃষ্ণাময় এক পথে; কিন্তু সঙ্গী ঐতিহ্যময় বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ আবহমান, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের সাথে সংলগ্ন, স্থানিক ও সংগ্রামী। প্রকৃতি ও মানুষের যুথবদ্ধ জীবনাচার ও জীবনাভিযানের লক্ষ্যে প্রত্যয়ী।

“আমরা প্রতীকহীন হাতে কোন পতাকা নিইনি।

আমাদের সঙ্গে এক বাউলের বিধবা যাবেন

উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটি ছাড়া

তৃষ্ণার রাস্তায় আর অন্য কোন যুবতী যাবে না।”

[“জল দেখে ভয় লাগে”, কালের কলস]^{২১}

কবি নগরযন্ত্রণার উল্টোপথে তাঁর কাক্সিক্ষিত জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছেন পুরোপুরি। ফলে তাঁর উদ্বেগ, সংশয় ও ভয় ক্রমাগত মুছে গেছে। কবি ফিরে এসেছেন গ্রামীণ জনপদে এবং আপন জীবন কাব্য পটভূমিতে। ধানক্ষেত, নদী-নালা, খালবিল-পাহাড় সমন্বিত যে লোকালয়, দুঃখের রাজত্ব যেখানে নিশ্চিত জেনেও কবি ফিরে এসেছেন—

“দুঃখের রাজত্বে তবে পলাতক আমরা ক’জন
আবার এসেছি ফিরে; আমাদের ক্লান্তিহীন মন
একদিন জনপদ ছেড়ে এই ক্লান্ত কানড়বাময়
পরিণাম চিন্তা করে দেশত্যাগী কবির হৃদয়
নিয়ে যেন পার হয়ে গিয়েছিলো নিজের এ কূল,
কিন্তু আজ মাছ পাখি নাও নদী মাটির পুতুল
বহমান মানুষের অনিবার্য প্রতীকের কাজে
আবার এসেছে ফিরে অন্তঃস্থ, নিজের সমাজে।”
[প্রত্যাবর্তন, কালের কলস]^{১০}

আল মাহমুদের ‘আধুনিকতা’ কবিতার সামগ্রিক রূপকল্পে বিরাজমান। তাঁর কবিতায় যে শব্দ, শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয় তা সরাসরি গ্রামীণ আবহ, সমাজ, সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে ওঠে স্বদেশের প্রতিবিম্ব। কাব্যযাত্রার সূচনাকাল থেকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় আল মাহমুদ স্বদেশ চেতনায় অনুপ্রাণিত। এই বোধ থেকেই তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ও বাংলা কাব্যের উত্তরাধিকার আত্মস্থ করেন। পুর, পাটিকেরা, গৌতম, শ্রীজ্ঞান, কাহুপা, অনার্য প্রাচীন, মহাস্তানগড়, শীলভদ্র, মুকুন্দরাম, ব্যাধের আদিম সাজ,^{১১} আলাওল, রোসাদের অশ্ব, লালন, বাউল, বেহুলা, মঙ্গলকুলোয় ধান্য ইত্যাদির সমন্বিত ধারা এসে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে। অতীতের বর্তমানতায় উজ্জীবিত কবি—

“স্বদেশভূমি, ভূমি, তোমার নাম
শুনেছিলাম মাংস থেকে মা’র
ফাটিয়ে দিয়ে শহর ঘর গ্রাম
আমরা কটি পুত্র কানু পা’র।”^{১২}
[শরীর থেকে মা’র, কালের কলস]

ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আধুনিকতার সমন্বয় : আল মাহমুদের কবিতায় ধর্মও এসেছে এক আধুনিক দৃষ্টিকোণে। তিনি অন্ধ বিশ্বাসে মগ্ন নন, বরং ইতিহাস ও ধর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষের আত্মিক সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তাঁর ‘বখতিয়ারের ঘোড়া’ কাব্যগ্রন্থে ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

“বখতিয়ারের ঘোড়ার হেঁচকি শুনি
শিরা উপশিরায় কেঁপে ওঠে আমার ঈমান।”^{১৩}

আল মাহমুদের কবিতায় ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাতৃভূমি, মৌলিক বিশ্বাস প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু কখনোই তা পুরনো দিনের জড়তা হয়ে ওঠেনি। বরং এসব উপাদানকে তিনি আধুনিক কাব্যচেতনার আলোকে নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন। তাই তিনি মৌলিক ও চিন্তাশীল আধুনিক কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

প্রথম জীবনে আল মাহমুদ অনেকটা সংশয়বাদী, বামপন্থী, মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ধারায় থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাসের বলয়ে পরিবর্তন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় লাভকারী মুক্তিযোদ্ধা কবি। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে ফিরে তৎকালীন সরকারের বিরোধিতার কারণে কারারুদ্ধ হন। এ কারাবাস কালেই তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সংঘটিত হয়।

তাঁর ভাষায় আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগত-রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। এভাবেই আমি ধর্মে এবং ধর্মের সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ বীজমন্ত্র পবিত্র কুরআনে এসে উপনীত হয়েছি।^{১৭} এরপর কবি আরো স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কথা উচ্চারণ করেন—
“আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহলোকেই আমার ধর্ম, ইহলোক ও পারলৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি। আমি মনে করি একটি পারমাণবিক বিশ্ববিনাশ যদি ঘটেই যায়, আর দৈবক্রমে মানবজাতির কিছু অবশেষ চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে তবে ইসলামই হবে তাদের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার কবিস্বভাবকে আমি উৎসর্গ করেছি। আল মাহমুদের কবরের এপিটাফে লেখা আছে বিশ্বাসের সৌরভমাখা একটি কবিতা। কবিতার প্রতিটি লাইন থেকে ঝরে পড়ছে যেন নিবেদন। মাশুকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আশেকের মনে যেমন উদ্বেলিত আনন্দের উচ্ছ্বাস থাকে, সেই উচ্ছ্বাসটুকু দেখতে পাই তার এপিটাফে খোদাই করা কবিতায়। কবিতাটি এখন আমাদের দোলায়। বিশ্বাসের অনুভবে আন্দোলিত করে।

কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ।”^{১৮}

সবাই মৃত্যুকে জয় করার কথা বলে। জীবনের খেলাঘরে থেকে যাওয়া এলোমেলো খেলনা গুলোর জন্য আক্ষেপ করে। আল মাহমুদ আক্ষেপ করেননি, বরং ঈদের আনন্দে মৃত্যুকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

কবি আল মাহমুদের কাব্যে ইসলামী ভাবধারাকে আমরা তিনটি পর্বে বিভক্ত করেছি –

প্রথম পর্ব : কবি আল মাহমুদ তার কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্য চর্চার সূচনা করেন তার রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ লোকলোকান্তর এ।

দ্বিতীয় পর্ব : কবি তার কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়েছেন নিজস্ব বিশ্বাস, নির্মল অনুভবের রাখডাকহীন বর্ণনা, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো’, অদৃশ্যবাদীদের রান্নাবান্না ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে।

তৃতীয় পর্ব : কবি আল মাহমুদ তার কবিতায় ইসলামী মনোভাব ও স্রষ্টার দরবারে নিজেকে আত্মসমর্পনের ব্যাকুলতা ও স্রষ্টাকে পাওয়ায় আকুলতা প্রকাশ পায় কবির ‘দ্বিতীয় ভাঙন’, ‘আরব্য রজনীর রাজহাস’ ও ‘মিথ্যাবাদী রাখাল’ ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে।

শেষ পর্যায়ে এসে কবির কবিতায় ইসলামের মনোভাবের পূর্ণতা পায়। স্রষ্টাকে পাওয়ার আকুলতা, স্রষ্টার দরবারে নিজেকে সমর্পণের ব্যাকুলতা কবিকে তাড়িত করে। দ্বিতীয় ভাঙন কাব্যগ্রন্থের ‘ভরহীন’ কবিতায় বলেন, -

“স্তুকতার মত শুধু বলে ওঠা, তোমাকে পেলাম।

তোমার নামে প্রেম দরিয়ার ঢেউয়েরা লাফায় নুনের গুঞ্জন ওঠে আটলান্টিকে,

কি অশান্ত জলনামের মহিমাগায় মেঘপুঞ্জ।

পাখির কুলায় নামের জিকির ওঠে।

দশদিকে তোমার গজল।

অস্তিম পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

আর নেই ভর এখন আমাকে ধর

মেলে দিয়ে নূরের চাদর।

‘দ্বিতীয় ভাঙন’ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রার্থনার ভাষা’ কবিতায় বলেন -

‘প্রার্থনার ভাষা দাও প্রভু,

নির্জর্জন আত্মসমর্পণের সহজতা।

আমি কি পাড়ি দিয়ে যাচ্ছি না হাঙরসংকুল সমুদ্রের চেয়ে দুরূহ যে আয়ু?

সেই দিন এবং রাত্রি?

উদয় আর অস্ত।

আঁধার এবং আলো।

পৌঁছুতে চাই প্রভু তোমার সান্নিধ্যে

তোমার সিংহাসনের নিচে একটি ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে।

যার পাখায় আঁকা অনাদিকালের অনন্ত রহস্য।”^{১৯}

একজন কবি কখনো তাঁর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ঐতিহ্যের নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করেন বর্তমানের শক্তি ও সম্ভাবনা। আগামীর স্বপ্ন ও উদ্দীপনা। তিনি সৃষ্টি ও বিনাশের মালিক, সমস্ত আলোর উৎস এবং নিরাকার আলোর মতো তাঁর স্বরূপ। কবি এই মহান শক্তির ভক্ত। কবি সবসময় উৎগ্রীব হয়ে গুণগান গায়তে থাকেন স্রষ্টার আলোয় আলোকিত হবার এবং প্রেমভাবে তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। কালের বিচারে তুমি মহাকাল, অনন্ত সময় আমি এক কবি মাত্র, গুণ গাই, আমার কী ভয়।”^{২০}

‘এক চক্ষু হরিণ’ গ্রন্থের ‘ঠিকানাহীন নাওয়ার ভাসান’ কবিতায় নৌকার প্রতীকে অভিসার, পীরের মাহাত্ম্য ও আল্লাহর প্রেমভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঠিকানাহীন নাওয়ার ভাসান ঠেকলো অজান চরে হালের মুঠি ছেড়ে শ’তান ডুবলো রে অন্তরে। বাতাস এসে ছড়িয়ে দিল বদর পীরের ফুঁবুকের মাঝে উঠলো জিকির আল্লাহ আল্লাহ।”^{২১}

‘দোয়েল ও দয়িতা’ কাব্যের ‘হে আমার আরম্ভ ও শেষ’ কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি ভক্তিপ্রেম ও শেষ আশ্রয় প্রার্থনা করেন। স্রষ্টা সীমাহীন কালের নিয়ন্তা এবং সৃষ্টির উত্থান-পতন-পরিবর্তন-জন্ম-মৃত্যুর মালিক। কবি তাই জীবনের সূচনা ও সমাপ্তির নির্ধারক সেই স্রষ্টার প্রতি নিবেদন -

“হে আমার আরম্ভ ও শেষ।

অনন্তের কিনারা আমার এবার আমাকে নাও।

অপ্রস্তুত আত্মা আমি।

কিন্তু জানি তুমি ছাড়া আমার দৌল্যমান শরীরের নৌকাখানি অন্যঘাটে জমায়নি পাড়ি।

পারানির কড়ি নেই। কিন্তু ছিল তোমাকে ভরসা।

পাপী আমি। কিন্তু জানি বহুদূরে আছে এক ক্ষমার তোরণ।

ভ্রান্ত আমি। কিন্তু জানি আছে এক দয়াদ্র হাসির দীপ্তি অনন্তে, অসীমে।

হে আমার আরম্ভ ও শেষ।”^{২২}

আল মাহমুদ বলেছিলেন, সুফিমত আমার কবিতায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছে! আর পবিত্র কুরআন আমার কবিতা লেখার প্রধান পাথেয়! পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থটি বুকের ওপর রেখে কবি যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর তার চেতনা লোকের মায়াবি পর্দা দুলে উঠল। যার ফাঁক দিয়ে ধরা পড়ছে রহস্যময় স্বপ্ন। কবি চলে যান সেই মুহূর্তে, যখন নামুস জিবরাইল পৃথিবীর শেষ পয়গাম্বরকে আদেশ করেন, পাঠ করো। সেই পাঠের দ্যুতিতে স্নিগ্ধ হয়ে কবি জানালেন ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা, বখতিয়ারের ঘোড়া কাব্যগ্রন্থের সবুজ ঈমান কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়, কবি বলেন -

“ঘুমের মধ্যে কারা যেন, মানুষ না জিন

আমার কবিতা পড়ে বলে ওঠে, আমিন, আমিন!”^{২৩}

উপসংহার : আল মাহমুদ বাংলা কবিতায় আধুনিকতার একটি ভিন্ন ও শক্তিশালী ধারার জন্ম দিয়েছেন। তিনি শুধু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কবিতা লেখেননি, বরং সময়কে ছুঁয়ে গেছেন নিজের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও ভাষাশৈলীর মাধ্যমে। তাঁর কবিতা গ্রাম ও শহরের, প্রেম ও ধর্মের, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাই আল মাহমুদের কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ফলাফল পর্যালোচনায় নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে এসেছে - আল মাহমুদের

কবিতায় আধুনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আল মাহমুদের কবিতায় আধুনিকতার এক মৌলিক ধারক তাঁর কবিতা আধুনিক জীবনবোধ, বাস্তবতা, প্রেম-যৌনতা, ধর্মচিন্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নানা দিককে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় ইসলামী ইতিহাস, চিত্রকল্প, প্রতীক ও উপমা আধুনিক কাব্যধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাঙালি ঐতিহ্য ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আধুনিক কাব্যভাষায় রূপ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিকতা মানেই পশ্চিমমুখী হওয়া নয়। নিজের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে থেকেও একজন কবি আধুনিক হতে পারেন। এই অবস্থান তাঁকে অন্যান্য আধুনিক কবিদের থেকে পৃথক ও অনন্য করেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আধুনিক কাব্য', সাহিত্যের পথে', পৃ. ৪৬৩
২. প্রগুক্ত, পৃ. ৪৬৯
৩. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, 'ভূমিকা', আধুনিক বাংলা কবিতা (১ম সং; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ. ৮
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যরূপ', 'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খ- (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০২), পৃ. ৫১১
৫. আহসান, ক্রসয়দ আলী, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষ্ণে (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৬), পৃ. ১৯
৬. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১), পৃ. ৭২
৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ (৭ম প্র., কলিকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা.লি., ১৩৯৫), পৃ. ৮৪
৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ৭৪-৭৫
৯. খান, রফিকউল্লাহ, বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর, পৃ. ১৪১
১০. মাহমুদ, আল, খড়ের গম্বুজ, সোনালী কাবিন, ঢাকা, মহাকাল প্রকাশন, মার্চ, ২০২০ খ্রি., পৃ. ২৬
১১. মাহমুদ, আল, সোনালী কাবিন, ঢাকা, মহাকাল প্রকাশন, মার্চ, ২০২০ খ্রি., পৃ. ২৭
১২. মাহমুদ, আল, জলদেখে ভয়লাগে, কালের কলস, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, জানুয়ারী, ২০২৩, পৃ. ৯
১৩. প্রগুক্ত, পৃ. ২৭
১৪. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ৬০১-৬০২
১৫. মাহমুদ, আল, শরীর থেকে মার, কালের কলস, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, জানুয়ারী, ২০২৩, পৃ. ২০
১৬. মাহমুদ, আল, বখতিয়ারের ঘোড়া, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৪০
১৭. মাহমুদ, আল, কবির আত্মবিশ্বাস, (ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৩
১৮. মাহমুদ, আল, বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ, (একুশে বাংলা প্রকাশন, ২০১৫, ফেব্রুয়ারী), পৃ. ৬৯
১৯. মাহমুদ, আল, দ্বিতীয় ভাঙ্গন, ঢাকা, সরল রেখা প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ৯২
২০. মাহমুদ, আল, মিথ্যাবাদী রাখাল, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ৫৪
২১. মাহমুদ, আল, এক চক্ষু হরিণ, চট্টগ্রাম, নন্দন প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ৩৪
২২. মাহমুদ, আল, দোয়েল ও দয়িতা' চট্টগ্রাম, অক্ষরবৃত্ত, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ৪৩
২৩. মাহমুদ, আল, বখতিয়ারের ঘোড়া, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৪০